বাংলাদেশের চারজন মুসলিম দিশারী

মাহবুবুর রহমান

বাংলাদেশের
চারজন মুসলিম দিশারী

মাহবুবুর রহমান

বাড কম্প্রিন্ট এন্ড পাবলিকেশন্স

প্রথম প্রকাশ ❑ একুশে বইমেলা ২০০৭

বাংলাদেশের চারজন মুসলিম দিশারী ❑ মাহবুবুর রহমান

প্রকাশক ❑ মোহাম্মদ শিহাব উদ্দিন, বাড কম্প্রিন্ট এন্ড পাবলিকেশন্স

৫০ বাংলাবাজার, পাঠকবন্ধু মার্কেট, ঢাকা-১১০০, ফোন : ৭১১১৯৯৩

কম্পিউটার সেটিং ❑ বাড কম্প্রিন্ট ৫০ বাংলাবাজার

মুদ্রণে ❑ পিএ প্রিন্টার্স, সুত্রাপুর, ঢাকা-১১০০

প্রচ্ছদ ❑ শিল্পায়ন, বাংলাবাজার, ঢাকা।

মূল্য ❑ ৬০.০০ টাকা

ISBN-984-839-090-01

ভূমিকা

বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে সুফী সাধকদের অবদান ছিল অপরিসীম। সপ্তম শতাব্দিতে আরবের বুকে ইসলামের আবির্ভাব ঘটে। হিজরীর প্রথম দশকেই এ দেশে ইসলামের মহানবাণী পৌঁছে যায়। প্রাচীনকাল থেকে ভারতীয় উপমহাদেশের সাথে আরবদের ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্পর্ক ছিল। প্রাথমিক সময়ে এই ব্যবসায়িক দলের কেউ কেউ স্থানীয় রমনীদের বিয়ে করে এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকে। তাদের কেউ কেউ এদেশে ইসলাম ধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। এরই ধারাবাহিকতায় সুফী সাধকরা বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে এসে পবিত্র ধর্ম ইসলামের মহানবাণী জনগণের মাঝে পৌঁছে দেন। তারা তাদের সু-মহান চরিত্র, মাধুর্য ও মানবতা দ্বারা এদেশের মানুষের মনে গভীরভাবে প্রভাব ফেলে। তারা জনগণের মাঝে সাম্য ও মৈত্রীর বাণী পৌঁছে দেন। তাদের দৃঢ় মনোবল, অনাড়ম্বর জীবন যাপন, মানুষের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, ন্যায়বিচার ইত্যাদির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে দলে দলে লোকজন ইসলামের সুশীতল ছায়ায় এসে আশ্রয় গ্রহণ করতে থাকে। তারা এদেশে ইসলাম প্রচার ও প্রসারে তাদের জীবনও উৎসর্গ করেন। ত্রয়োদশ শতাব্দির প্রথম দিকে ১২০৪ খ্রিস্টাব্দে বখতিয়ার খলজীর নদীয়া বিজয়ের মাধ্যমে এদেশে মুসলিম শাসনের সূচনা হয়। এদেশের মুসলিম শাসকেরা ইসলাম ধর্ম প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে নিজেরা যেমন অসংখ্য মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকা স্থাপন করে

অবদান রাখেন ঠিক তেমনিভাবে তারা সুফী সাধকদের ব্যাপকভাবে পৃষ্ঠপোষকতা দান করেন। মূলতঃ বাংলার সুলতানদের উদার ইসলামিক মানসিকতার ফলে সুফীরা ব্যাপকভাবে বাংলাদেশে ইসলাম প্রচার করবার সুযোগ লাভ করে। তবে দুঃখজনক হলেও সত্য যে, এদেশে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা লাভ করবার পর থেকে ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের পলাশীর যুদ্ধের আগ পর্যন্ত আমরা এমন কোন ঐতিহাসিক বা সুফী সাধকদের জীবনীকার পেলাম না যারা সঠিকভাবে সুফীদের জীবনাচরণ লিপিবদ্ধ করে গিয়েছে। বাংলার সুফী সাধকদের জীবনী রচনা করতে গেলে আমাদেরকে প্রধানত কিংবদন্তীর (গল্প) উপর নির্ভর করতে হয়। এই কিংবদন্তীতে সুফীদের জীবনী ও তাদের কার্যাবলী সম্পর্কে এমনভাবে রং মেশানো হয় তা ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখা যায় যে, তার সাথে ইতিহাসের কোন সম্পর্ক পাওয়া যায় না। কাজেই, বাংলাদেশের সুফী সাধকদের সঠিক জীবনী ও তাদের কার্যাবলী তথ্যপূর্ণ ও বিশ্লেষণপূর্ণ ইতিহাস রচনা করা বড়ই কঠিন। তবে আশার কথা হল যে, বাংলাদেশের সুফীদের সঠিক ইতিহাস রচনা করবার জন্য বর্তমানে প্রচুর উপাদান আবিষ্কার হয়েছে। এই সমস্ত উপাদানগুলো ব্যবহার করে সুফীদের সঠিক ইতিহাস নির্ণয় করা সহজ ও যুক্তিপূর্ণ।

বর্তমান গবেষণায় আমরা বাংলাদেশের চারজন সুফীদের জীবনী ও তাদের কার্যাবলী ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে সঠিক পদ্ধতিতে নির্ণয় করবার প্রয়াস পেয়েছি। এক্ষেত্রে আমরা সহায়তা নিয়েছি মুদ্রা, শিলালিপি, বিদেশী পরিব্রাজকদের বিবরণ, সমসাময়িক গ্রন্থাবলী, সুফীদের মলফুজ ও আধুনিক গবেষণা। এতে আমরা উদ্ধার করবার চেষ্টা করেছি এই চারজন সুফীর সঠিক ইতিহাস।

ইতিহাস হল জাতির দর্পণ। সঠিক ইতিহাস যেকোন জাতিকে গৌরবের স্বর্ণশিখরে আরোহণ করে নিয়ে যেতে পারে। আবার ভুল ইতিহাস জাতিকে চরম অনিশ্চয়তার দিকে নিয়ে যায়। তাই আমরা এই গবেষণা কর্মে সঠিক ইতিহাস নির্ণয় করবার চেষ্টা করেছি।

গ্রন্থ প্রকাশের ব্যাপারে আমি বিভিন্নজনের কাছ থেকে উৎসাহ ও উদ্দীপনা পেয়েছি। এছাড়া এশিয়াটিক সোসাইটির লাইব্রেরী, ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের লাইব্রেরীর কাছে আমার কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা জানা নেই।

যেসব গবেষকদের গ্রন্থ থেকে তথ্য নেয়া হয়েছে আমি তাদের কাছে চির কৃতজ্ঞ। গ্রন্থে ব্যবহৃত ছবিসমূহ বিভিন্ন জায়গা থেকে নেয়া হয়েছে। আমি তাদের কাছেও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

এই গ্রন্থ প্রকাশে বাড কম্প্রিন্ট এন্ড পাবলিকেশন্সের প্রকাশক জনাব শিহাবউদ্দিন সাহেবের প্রতি আমি চির কৃতজ্ঞ। তিনি অনেক যত্ন করে এই মূল্যবান গবেষণা কর্মটি প্রকাশ করে জাতীয় দায়িত্ব পালন করেছেন অত্যন্ত নিখুতভাবে। এছাড়াও এই প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রতি রইল আমার আন্তরিক মোবারকবাদ।

ঢাকা ফেব্রুয়ারি, ২০০৭ মাহবুবুর রহমান

উৎসর্গ

বাংলাদেশে যারা ইসলাম ধর্ম প্রচার
করবার জন্য নিজেদের জীবন
উৎসর্গ করে দিয়েছেন তাদের
মহান স্মৃতির উদ্দেশ্যে
নিবেদিত

লেখকের প্রকাশিত গ্রন্থ

বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য (গবেষণামূলক)

নতুন প্রভাত দিনে (কবিতা)

সূচীপত্র

হযরত বাবা আদম শহীদ (রহঃ)

ত্রয়োদশ শতাব্দির প্রথম দিকে ১২০৪ খ্রিস্টাব্দে বখতিয়ার খলজীর নদীয়া[১] বিজয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশে মুসলিম শাসনের সূচনা হয়। সপ্তম শতাব্দিতে আরবের বুকে ইসলামের আবির্ভাব ঘটে। ৬১০ খ্রিস্টাব্দে মহানবী (সঃ) নবুয়ত প্রাপ্ত হন। নবুয়ত প্রাপ্তির পর তিনি প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। এরপর মক্কার কুরাইশদের অসম্ভব অত্যাচার ও নির্যাতনের ফলে তিনি ৬২২ খ্রিস্টাব্দে মদিনায় হিজরত করেন। হিজরতের পর ৬২৪ খ্রিস্টাব্দে "মদিনা সনদের" মাধ্যমে সেখানে সর্বপ্রথম ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে আর মক্কায় ও মদিনার মধ্যে ইসলাম সীমাবদ্ধ থাকেনি। সমগ্র বিশ্বে সাহাবীদের মাধ্যমে ইসলামের দ্রুত প্রচার ও প্রসার ঘটতে থাকে। এরই ফলশ্রুতিতে হিজরীর প্রথম দশকেই হযরত ওমর (রাঃ) এর খিলাফত কালে (৬৩৪-৪৪ খ্রিঃ) মহানবী (সঃ) এর দুই সাহাবী হযরত মামুন (রাঃ) ও হযরত সুহায়মিন (রাঃ) বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে আসেন বলে জানা যায়[২]। আবার অন্য সূত্রে জানা যায় যে, রাসূল (সঃ) এর মাতুল সাহাবী আবু ওয়াক্কাস (রাঃ)-ই প্রথম

ইসলাম প্রচারক যিনি সমুদ্র পথে বাংলাদেশে আগমন করেন[৩]। সেই থেকেই শুরু হয় এদেশে ইসলাম আগমনের শুভবার্তা। মূলতঃ আরব বনিকেরা ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে চট্টগ্রামে আগমন করত। তারা যে সেখানে শুধু ব্যবসা-বাণিজ্য করত তাই নয়। তাদের মধ্যে কেউ কেউ স্থানীয় রমণীদের বিবাহ করে স্থায়ীভাবে সেখানে বসবাস করতে থাকে। আবার কেউ কেউ ইসলাম প্রচারে তাদের জীবন উৎসর্গ করেন। কালক্রমে সুফী সাধকদের মাধ্যমে এদেশে ইসলামের প্রচার ঘটতে থাকে। বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রাথমিক যুগের সুফীবৃন্দের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন শাহ সুলতান রুমী, তুর্কান শাহ, মখদুম শাহ দওলা শহীদ, শাহ সুলতান বলখী মাহী সওয়ার প্রমুখ। এদেশে ইসলাম প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে যে সমস্ত সুফীদের অবদান ছিল অপরিসীম তাদের মধ্যে বাবা আদম শহীদ (রহঃ) ছিলেন অন্যতম। তিনি ছিলেন পবিত্র মক্কা নগরীর অধিবাসী। তিনি বাংলাদেশে ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠা করবার উদ্দেশ্যে আগমন করেন। কিংবদন্তী মতে, তিনি সেন বংশের রাজা বল্লাল সেনের (১১৫৮–১১৭৯ খ্রিঃ) রাজত্বকালে গো-হত্যার দায়ে রাজা কর্তৃক নির্যাতিত জনৈক একজন হজ্বযাত্রির মুখে কথা শুনে তিনি পবিত্র নগরী মক্কা ছেড়ে একটি ছোট খাটো সেনাবাহিনী নিয়ে ঢাকার বিক্রমপুরের রামপালের অন্তর্গত আবদুল্লাহ্পুর গ্রামে এসে উপস্থিত হন। গ্রামে এসে তাবু স্থাপন করে খাবার জন্য তারা একটি গরু যবেহ করেন। ঠিক তখনই একটি চিল মুসলিম শিবির থেকে এক টুকরো গোস্ত ছো মেরে নিয়ে রাজার সেনা শিবিরের উপর দিয়ে উড়ে যেতে থাকে। ঠিক এমন সময় অন্য একটি চিল প্রথম চিলের কাছ থেকে গোস্তের টুকরাটি ছিনিয়ে নিতে চায়। এই গোস্তের টুকরার জন্য উভয় চিলের মধ্যে হাতাহাতির সূত্রপাত

ঘটে। ফলে এক সময় এই গোস্তের টুকরাটি রাজার সৈন্যদের শিবিরে এসে পড়ে। তখন হিন্দু সৈন্যরা এই গোস্তের টুকরাটি নিয়ে রাজা বল্লাল সেনের কাছে নিয়ে যায়। গরুর গোস্ত দেখেতো রাজা প্রচণ্ড রেগে যায়। কারণ, গরু হল হিন্দুদের কাছে দেবতা। এই দেবতাকে হত্যা করলো কোন নরাধম। তা জানার জন্য রাজা নির্দেশ দেন। শেষে জানা যায় যে, যবনরা[৪] (মুসলমান) এই কাজ করেছে এবং তারা রাজার সাথে যুদ্ধ করবার জন্য এসেছে। এ খবর পেয়ে রাজা বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে বাবা আদমের মোকাবেলা করেন। ১৪ দিন ধরে যুদ্ধ চলার পর যখন রাজা দেখলো যে যুদ্ধে তার যেতার কোন সম্ভাবনাই নেই, তখন তিনি নিজেই যুদ্ধক্ষেত্রে আসলেন। যুদ্ধের ফলাফল সম্পর্কে রাজা নিশ্চিত না হয়ে প্রাসাদে তিনি পরিবারের কাছে খবর পাঠান যে, যদি রাজার পরাজয় ঘটে, তাহলে তারা যেন যবনদের হাত থেকে বাঁচবার জন্য অগ্নিকুণ্ড তৈরি করে তাতে ঝাপ দিয়ে প্রাণ বিসর্জন দেয়। যুদ্ধে পরাজয়ের বার্তা বহনের জন্য রাজা নিজ পোশাকের নিচে একটি সংকেতবাহী কবুতর রেখে দেন। রাজার যুদ্ধে আগমনের সাথে সাথে যুদ্ধের মোড় ঘুরে যায়। যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয় ঘটে। পরাজয়ের আশংকায় যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে বাবা আদম শহীদ (রঃ) জীবনের শেষ নামাজ আদায় করবার জন্য দাঁড়ান। তা দেখে রাজা বল্লাল সেন এই সুযোগে বাবা আদমকে হত্যা করবার জন্য অগ্রসর হন। রাজা বল্লাল সেন নামাজরত বাবা আদমের ঘারে বার বার তলোয়ারের সাহায্যে আঘাত করার পরও বাবা আদমের কোন প্রকার ক্ষতি হয় নাই। বাবা আদম রাজাকে বলেন যে, রাজার তরবারি দিয়ে নয় বরং তার তরবারি দিয়ে তাকে আঘাত করতে। রাজা তাই করলেন। বাবা আদম শহীদ হলেন। যুদ্ধে জয়লাভ করে
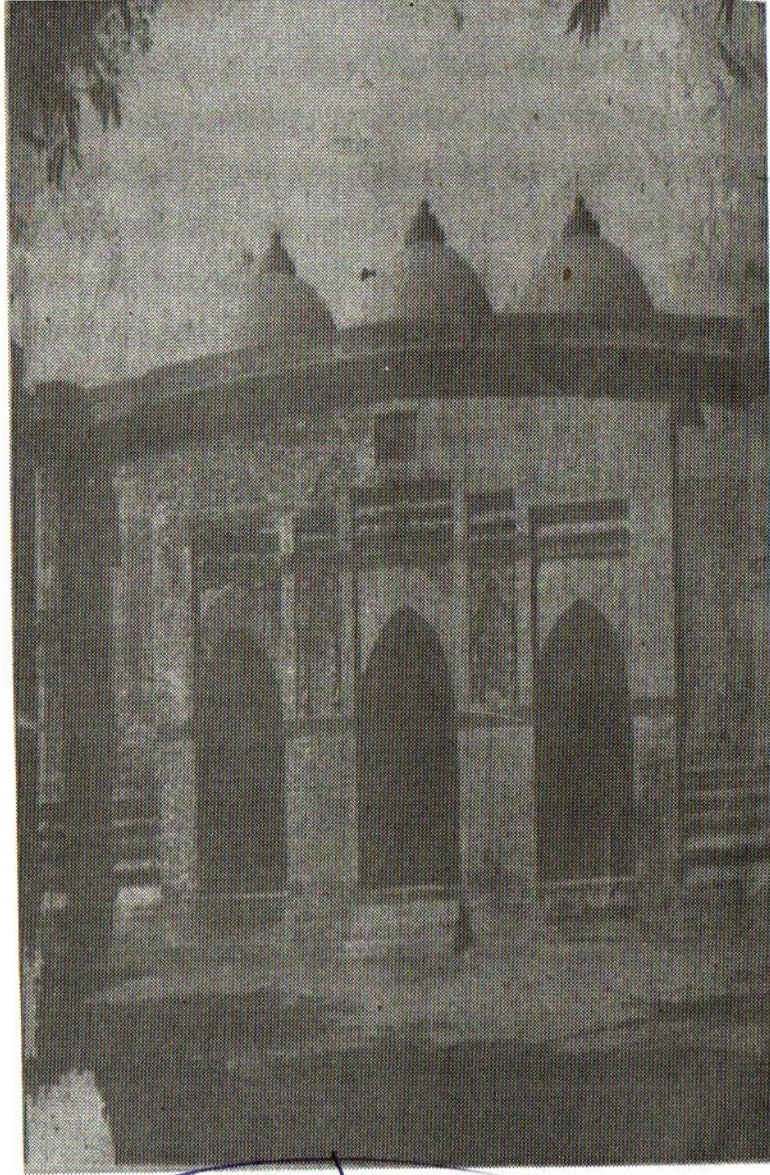
রামপাল, বাবা আদম শহীদের সমাধি

রাজা আনন্দের সাথে গোসল করবার জন্য নদীতে গেলেন। কিন্তু, রাজার পোশাকের ভিতর লুক্কায়িত কবুতর উড়ে চলে গেল প্রাসাদে। গোসল শেষে রাজা পোশাক পড়বার সময় লক্ষ্য করলেন যে, পোশাকের ভিতর লুক্কায়িত পরাজয়ের সংকেতবাহী কবুতর নেই। এতে রাজা বিচলিত হয়ে খুব দ্রুতগতিতে প্রাসাদের দিকে অগ্রসর হলেন। ওদিকে, পরাজয়ের সংকেতবাহী কবুতর প্রাসাদে আসতে দেখে রাজার পরিবার পরিজন সবাই রাজার পরাজয় হয়েছে ভেবে অগ্নিকুণ্ডে ঝাপ দিয়ে আত্মহত্যা করলো। রাজা প্রাসাদে ফিরে এসে তা দেখে সে কুণ্ডে ঝাপ দিয়ে নিজেও তার প্রাণ বিসর্জন দিলেন। এ হল বাবা আদম শহীদ (রহঃ) সম্পর্কে প্রচলিত কিংবদন্তী।

উপরিউক্ত কাহিনীর ভিত্তিতে আমাদের সমাজে এতদিন ধরে প্রচলিত আছে যে, বাবা আদম শহীদ বাংলায় তুর্কী আক্রমণের পূর্বে সেন রাজা বল্লাল সেনের সময়ে বাংলাদেশে আসেন। বাবা আদম শহীদ (রহঃ) এর কবরের উপর কোন সমাধিভবন নেই। আমাদের হাতে এমন কোন জোড়ালো তথ্যও নেই যার উপর ভিত্তি করে আমরা নিশ্চিন্তে বলতে পারি যে, এখানেই বাবা আদম শহীদ (রহঃ) শায়িত আছেন। বাবা আদম শহীদ (রহঃ) এর মাযার সংলগ্ন একটি মসজিদ আছে। মসজিদে উৎকীর্ণ শিলালিপি মতে, মসজিদটি ৮৮৮ হিজরী ১৪৮৩ খ্রিস্টাব্দে বাংলার সুলতান জালাল-উদ-দীন ফতেহ শাহের কর্মচারী মালিক কাফুর নির্মাণ করেন। এই শিলালিপিতেও বাবা আদম শহীদ (রহঃ) সম্পর্কে কোন তথ্য নেই। তাই প্রখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া মনে করেন যে, এখানে বাবা আদম শায়িত নেই। বাংলায় তুর্কী-আক্রমণের পূর্বেও বাংলাদেশের সাথে যে আরব বনিকদের যোগাযোগ ছিল তা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি।

এই সূত্র ধরেই তাদের মাধ্যমে যে এদেশে ইসলাম ধর্ম প্রচারিত হয় তাও বলা যায়। তবে বাবা আদমের সাথে সেন বংশের রাজা বল্লাল সেনের যুদ্ধের কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই। তবে আনন্দ ভট্টের বল্লাল চরিতে বাবা আদমের সাথে রাজা বল্লালসেনের উপরিউক্ত ঘটনার বিবরণ আছে[৫]। যদিও আধুনিক পণ্ডিতেরা এই বল্লাল চরিতের প্রামাণিকতা নিয়ে সন্দেহ পোষণ করেন। এই বল্লাল চরিতের রচনায় তারিখ ষোড়শ শতাব্দির আগে নয়। নগেন্দ্রনাথ বসু যা বলেন তার সারসংক্ষেপ করলে দেখা যায় যে, চতুর্দশ শতাব্দির শেষ ভাগে বল্লালসেন নামে বিক্রমপুরে একজন প্রতাশালী জমিদার বাস করতেন। আর তিনিই আনন্দ ভট্টকে আদেশ দেন বল্লাল চরিত রচনা করতে। এখন আমরা সমস্ত ঘটনাসমূহ পর্যালোচনা করে দেখবো যে প্রকৃত ঘটনা আসলে কি ছিল।

বখতিয়ার খলজীর নদীয়া বিজয়ের আগে সৈন্যবাহিনী নিয়ে কোন মুসলমানের বাংলাদেশে আগমনের কথা ইতিহাসে পাওয়া যায় না। আমরা বাংলার ইতিহাস পর্যালোচনা করেও এমন কোন তথ্য পাইনি। বাংলার সেন বংশের ইতিহাস পর্যালোচনা করেও এমন কোন তথ্য পাওয়া যায় না। রাজা বল্লালসেনের রাজত্বকাল পর্যালোচনা করেও আমরা তার সাথে যে মুসলমানদের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল সে সম্পর্কে কোন নিদর্শন পাই না[৬]। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে বাবা আদমের কবরের উপর কোন সমাধি ভবন নেই এবং মসজিদ সংলগ্ন শিলালিপিতেও বাবা আদমের নামের কোন নিদর্শন নেই। একমাত্র কিংবদন্তী আর বল্লাল চরিত ছাড়া তার সম্পর্কে জানার আমাদের হাতে আর অন্য কোন তথ্য নেই। যদি আমরা বল্লাল চরিত ও নগেন্দ্রনাথ বসুর কথা মেনে নেই তাহলে আমরা বলতে পারি যে, বিক্রমপুরের

প্রতাপশালী জমিদার বল্লাল সেনের সময়ে বাবা আদম এদেশে পবিত্র ধর্ম ইসলাম প্রচার করতে আসেন। রাজার বিরোধীতার সত্ত্বেও তিনি ইসলাম ধর্ম প্রচার কার্য চালিয়ে যান। শেষে রাজা বল্লালসেন তাকে হত্যা করেন। তিনি সুদূর মক্কানগরী থেকে এদেশে ইসলাম ধর্ম প্রচার করতে আসেন। এদেশে ইসলাম ধর্ম প্রচার ও প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন একজন কিংবদন্তীর মহানায়ক।

তথ্য নির্দেশ ঃ

১. বখতিয়ার সমগ্র বাংলা জয় করেনি, মিনহাজ বখতিয়ারের নদীয়া বিজরে কথা বলেছেন। বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন "তবকাত-ই-নাসিরী" মিনহাজ-ই-সিরাজ (অনু. আ. ক. ম. যাকারিয়া) ঢাকা-১৯৮৩।
২. বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন "বাংলাদেশে সুফী দর্শনের রূপরেখা" অধ্যাপিকা লাভলী আখতার ডলি, ঢাকা-২০০১ পৃ. ৫৬।
৩. "যশোর জেলায় ইসলাম প্রচার ও প্রসার "নাসির হেলাল, ঢাকা-১৯৯২, পৃ. ৩৭।
৪. হিন্দুরা মুসলমানদেরকে খারাপ ভাষায় যবন বলে।
৫. বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন "বাংলার ইতিহাস (সুলতানী আমল)" ডঃ আবদুল করিম, ঢাকা-১৯৯৯।
৬. বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন "বাঙ্গালার ইতিহাস (প্রথম খণ্ড)" রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় "গৌড়ের ইতিহাস" রজনীকান্ত চক্রবর্তী "বাংলাদেশের ইতিহাস" ডঃ এম. এ. রহিম, ডঃ এম. এ. চৌধুরী ও অন্যান্য "বাংলার ইতিহাস (প্রাচীনকাল থেকে ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দ)" ডঃ সৈয়দ মাহমুদুল হাসান।

হযরত শাহ আলী বাগদাদী (রহঃ)

ঢাকা জেলায় ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে শাহ আলী বাগদাদী (রহঃ)-এর অবদান ছিল অপরিসীম। ঢাকার মীরপুরে এই মহান দরবেশের মাযার অবস্থিত। তার নাম থেকে বুঝা যায় তিনি বাগদাদ নগরীর অধিবাসী ছিলেন। ১৪১২ খ্রিস্টাব্দে মাত্র ২০ বছর বয়সে তিনি ১০০ জন সুফী সাধক ও দরবেশ সঙ্গে নিয়ে বাগদাদ থেকে দিল্লীতে এসে হাজির হন। দিল্লীতে তখন তুঘলক বংশের রাজত্বকাল শেষ হয়ে সৈয়দ বংশের (১৪১৪–৫১ খ্রিঃ) রাজত্বকাল শুরু হয়। দিল্লীতে তিনি মহামূল্যবান দুটি জিনিস সঙ্গে নিয়ে আসেন। একটি হল রাসূলে করিম (সঃ)-এর কেশ বা দাড়ি এবং অপরটি হল বড়পীর হযরত আবদুল কাদির জিলানী (রহঃ)-এর জামা। তিনি দিল্লীর সৈয়দ বংশে বিবাহ করেন। পরে দিল্লী থেকে তিনি প্রথমে ফরিদপুরে আসেন[১]। ফরিদপুর থেকে তিনি ঢাকায় চলে আসেন[২]। ঢাকায় এসে তিনি ইসলাম ধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি ঢাকায় দীর্ঘদিন ইসলাম ধর্ম প্রচার কার্য চালিয়ে যেতে থাকেন। তার প্রভাবে বহু লোক দলে দলে এসে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে থাকেন। তিনি তার সুন্দর ব্যবহার ও

মহানুভবতার জন্য জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের কাছে শ্রদ্ধাভাজন হয়ে ওঠেন। তিনি চিশতিয়া তরিকার অনুসারী ছিলেন। এ প্রসঙ্গে ডঃ গোলাম সকলায়েন বলেন, "ঢাকা অঞ্চলে হযরত শাহ আলী (রহঃ) শাহ মুহম্মদ বাবু (রহঃ) এর কাছে চিশতিয়া তরীকার মুরীদ হন। অতঃপর তিনি ইসলাম প্রচারের আদেশ পান।"[৩] হযরত শাহ আলী বাগদাদী (রহঃ) বাংলাদেশে এসে দ্বিতীয় বারের মতো বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তিনি গভীরভাবে আল্লাহ্‌র প্রেমে মগ্ন থাকতেন। খুব সম্ভবতঃ তিনি ১০০ বছর জীবিত ছিলেন[৪]। তার মৃত্যু সম্পর্কে একটি চমৎকার কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। আর তা হল ঃ তিনি একটি নির্জন গৃহে চিল্লায় বসেছিলেন। চিল্লার পূর্বে তিনি শিষ্যদেরকে বলে দিয়েছিলেন যে, ৪০ দিন পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত যেন কেউ তার সাথে দেখা করবার চেষ্টা না করে বা তাকে না ডাকে এবং কোন কারণেই যেন হুজুরার দরজা খোলা না হয়। ৩৯ দিন পার হওয়ার পর হঠাৎ ঘরের ভিতর থেকে আর্তনাদ শোনা গেল। মুরিদরা আর সহ্য করতে না পেরে দরজা ভেঙ্গে ঘরে ঢুকে দেখে যে, সমস্ত ঘর রক্ত দিয়ে ভরা এবং তিনি মৃত অবস্থায় পড়ে আছেন। আর কিছু আগে যেই শব্দ শোনা যাচ্ছিল ঘর খোলার সাথে সাথেই তা বন্ধ হয়ে গেল। তখন সবাই মিলে তাকে সেই স্থানেই কবর দিল। মনে হয় খুব সম্ভবতঃ তাকে হত্যা করা হয়। তার মৃত্যুর তারিখ নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। ডঃ মুহাম্মদ এনামুল হকের মতে তিনি ১৪৮০ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন[৫]। অধ্যাপক আবদুল মান্নান তালিব তার মৃত্যুর কাল ১৫১৭ খ্রিস্টাব্দ নির্ধারণ করেছেন[৬]। কিন্তু ডঃ গোলাম সাকলায়েন তার মৃত্যুর তারিখ ১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দ[৭] এবং রশীদ আহমদ একই মত[৮] পোষণ করেন। তবে আমরা তার মৃত্যুর সঠিক তারিখ নির্ধারণ করতে পারি।

বাংলার সমগ্র সুলতানী আমল বিশ্লেষণ করে আমরা তার মৃত্যুর তারিখ ১৪৮০ খ্রিস্টাব্দ বা তার আগের কোন এক সময়ে নির্ধারণ করতে পারি। এ সময়ে বাংলার সুলতান ছিলেন শামস-উদ-দীন ইউসুফ শাহ্। তবে আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে, তার অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলেই ঢাকা জেলায় ইসলামের ব্যাপক প্রসার ঘটে। তিনি এদেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করবার জন্য জীবন উৎসর্গ করে যান।

তথ্য নির্দেশ ঃ

১. তার দিল্লী থেকে ফরিদপুরে আসার কারণ হিসেবে অনেকে দেখিয়ে থাকেন যে, দিল্লীর সৈয়দ বংশের সুলতান তাকে ফরিদপুর জেলায় ১২ হাজার বিঘা পরিমাণ একটি পরগনা লাখেরাজ দান করেছিলেন। বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন" তাযকেরাতুল আওলিয়া" রশীদ আহমদ ঢাকা-২০০৩।" বাংলাদেশের সুফী সাধক ও অলী আওলিয়া" সাদেক শিবলী জামান ঢাকা-২০০১। এ সমস্ত বক্তব্য মোটেও সত্য নয়। কারণ ১৩৩৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলা ছিল সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন। এ সময়ে দিল্লীর কোন সুলতান বাংলা আক্রমণ করে দখল করতে পারেনি। আর দিল্লীর সৈয়দ বংশের (১৪১৪-৫১ খ্রিঃ) সুলতানদের দিল্লী, রোহিলা খণ্ডসহ খুব অল্প এলাকায় তাদের আধিপত্য ছিল। বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার কোন ভূ-সম্পত্তি দান করবার মতো কোন ক্ষমতা তাদের ছিল না।

২. তার ঢাকায় আগমন কাল ১৪৮৯ খ্রিস্টাব্দ বলে ডঃ গোলাম সাকলায়েন উল্লেখ করেন। বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন "বাংলাদেশের সুফী সাধক" ঢাকা-২০০৩। অধ্যাপিকা লাভলী আখতার ডলীও একই মত পোষণ করেন। বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন "বাংলাদেশের সুফী দর্শনের রূপরেখা" ঢাকা-২০০১।

৩. "বাংলাদেশের সুফী সাধক" ডঃ গোলাম সাকলায়েন পূর্বক্ত পৃ. ১৯৬।" তাযকেরাতুল আওলিয়ার" লেখক রশীদ আহমদও অনুরূপ মত পোষণ করেন। কিন্তু, সাদেশ শিবলী জামান তাকে কাদেরিয়া তরিকার অনুসারী বলে মনে করেন। বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন "বাংলাদেশের সুফী সাধক ও অলী আওলিয়া" ঢাকা-২০০১।

৪. ডঃ গোলাম সাকলায়েন বলেন, "হযরত শাহ আলী বাগদাদী (রহঃ) এ'শ বছর জীবিত ছিলেন বলে জানা যায়" প্রাগুক্ত পৃ. ১৯৭।

৫. বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন "A History of Sufi-ism in Bangal" Dr. Enamul Huq (মুহাম্মদ এনামুল হক রচনাবলী মনসুর মুসা সম্পাদিত) ৪র্থ খণ্ড ঢাকা-১৯৯৫।

৬. বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন "বাংলাদেশে ইসলাম" আবদুল মান্নান তালিব ঢাকা-১৯৯৪।

৭. বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন "বাংলাদেশের সুফী সাধক" ডঃ গোলাম সাকলায়েন প্রাগুক্ত।

৮. বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন "তাযকেরাতুল আওলিয়া" রশীদ আহমদ পূর্বক্ত।

হযরত শাহ আমানত (রহঃ)

চট্টগ্রাম জেলায় ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করবার জন্য যে কয়জন সুফী সাধকের অবদান ছিল অপরিসীম তাদের মধ্যে হযরত শাহ আমানত (রহঃ) ছিলেন অন্যতম। সম্ভবতঃ অষ্টাদশ শতাব্দির শেষ ভাগ বা উনবিংশ শতাব্দির প্রথম দিকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন, অন্ধ বিশ্বাসে পূর্ণ ও ধর্মীয় গোড়ামীর বেড়াজালে আবদ্ধ চট্টগ্রামবাসীদের মধ্যে ইসলামের মৌলিক অনুশাসনগুলো পুনরুজ্জীবিত করবার জন্য ও ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠা করবার জন্য তার আবির্ভাব গটে।

তিনি ছিলেন হযরত আবদুল কাদির জিলানী (রহঃ) এর বংশধর[১]। প্রথমে তিনি বিহারে বসবাস করেন এবং পরে চট্টগ্রামে আগমন করেন[২]। চট্টগ্রামে এসে তিনি জীবিকা নির্বাহের জন্য জর্জকোর্টে একটি সামান্য পিয়নের চাকরি গ্রহণ করেন[৩]। জনসাধারণের কাছে তিনি পরিচিত ছিলেন "খান সাহেব" নামে[৪]। তিনি যে কামেল ওলী ছিলেন তা প্রথমে তিনি জনগণের নিকট গোপন রাখেন। সারাদিন তিনি সরকারি চাকরি ক রতেন এবং অবসর সময়ে নিরিবিলি আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন থাকতেন। কিন্তু, একদিনের এক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তার

আধ্যাত্মিকতার কথা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। একদিন আদালতের কাজ শেষ করে শাহ আমানত (রহঃ) যখন বাড়ির দিকে ফিরছিলেন তখন তিনি দেখেন যে, এক লোক কোর্টের বারান্দায় বসে খুব কাঁদছেন। তখন তিনি লোকটিকে তার কাঁদার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। লোকটি তাকে জানালেন যে, আদালতে তার একটি মামলা আছে। উকিল সাহেব তাকে জানান যে, পরদিন তার মামলার শুনানী। কিন্তু উকিল সাহেব তাকে আগে এ বিষয়ে কিছুই জানাননি[৫]। এটা ছিল তার জমি সংক্রান্ত মামলা। এই জমিই তার বাঁচবার একমাত্র অবলম্বন। যদি তা চলে যায় তাহলে তার অবস্থা অনেক খারাপ হয়ে যাবে। তিনি জর্জ সাহেবকে খুব বিনীতভাবে অনুরোধ করেন যে, মামলাটি কয়েক দিনের জন্য পিছিয়ে দিতে। কিন্তু জর্জ সাহেব কোন কথাই শুনলেন না। তার সাথে প্রয়োজনীয় কোন কাগজপত্রও ছিল না। তিনি কাগজপত্রগুলো তার বাসায় রেখে এসেছেন। আদালত থেকে তার বাড়ি যেতে ২ থেকে ৩ দিন লাগবে। জর্জ সাহেব মাত্র একদিনের সময় দিয়েছেন[৬]। এতো তাড়াতাড়ি তিনি কিভাবে বাড়ি গিয়ে কাগজপত্র সঙ্গে নিয়ে আসবেন তা ভেবে অঝোরে কাঁদছিলেন। এ কথা শুনে হযরত শাহ আমানতের দরদী মন কেঁদে উঠলো। তিনি তাকে বললেন যে, তিনি কি এই জমি হালাল রুজী দ্বারা অর্জন করেছেন। লোকটি তাকে জানালো যে, তিনি তা হালাল রুজী দ্বারাই অর্জন করেছেন[৭]। তখন শাহ আমানত (রহঃ) লোকটিকে বলেন যে, তুমি আমার সাথে মাগরিবের পরে সদরঘাটে দেখা কর। লোকটি অনেক চিন্তা করে শেষ পর্যন্ত তার সাথে মাগরিবের পর সদরঘাট দেখা করেন। লোকটি দেখলো যে, শাহ আমানত (রহঃ) নদীর ঘাটে অনেক আগে থেকে দাড়িয়ে আছে। লোকটিকে দেখেই

তিনি বললেন যে, দেখি তোমার কোন উপকার করতে পারি কিনা। কিন্তু তোমাকে কথা দিতে হবে যে, আমি যা করব তা কারো কাছে বলতে পারবে না। একদম গোপন রাখবে। লোকটি তাকে কথা দিল। তখন তিনি তাকে চোখ বন্ধ করতে বললেন এবং তার রুমাল[৮] বের করে নদীতে রাখলেন। রুমালটি একটি নৌকায় পরিণত হল। সেই নৌকায় কোন মাঝি নেই। শাহ আমানত (রহঃ) লোকটিকে তাড়াতাড়ি তাতে উঠতে বললেন। লোকটি নৌকায় উঠলেন। মুহূর্তের মধ্যে নৌকা লোকটির বাড়ি পৌঁছে গেল। তিনি তার কাগজপত্র নিয়ে আবার মুহূর্তের মধ্যে যথাস্থানে ফিরে আসলেন। পরদিন লোকটি আদালতে তার কাগজপত্র দাখিল করলেন। কিন্তু, জর্জ সাহেব বললেন যে, তুমি না বললে তোমার কাছে কোন কাগজপত্র নেই। তাহলে এগুলো কোথা থেকে আসলো। লোকটি তখন জানালো যে তার এক নিকট আত্মিয়ের বাসায় কাগজপত্র রেখে এসেছিলেন। তা বলতে গতকাল তার মনে ছিল না। কিন্তু বিপক্ষের উকিল এ কাগজকে জাল হিসেবে বললো। তখন জর্জ সাহেব ধমকের সাথে লোকটির কাছে জানতে চাইলেন বিস্তারিত। তখন উপায় না দেখে লোকটি সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন। এতে জর্জ সাহেব অভিভূত হয়ে গেলেন এবং তারই পিয়ন এত বড় কামেল ওলী তা জানতে পেরে তাকে সম্মান জানালেন। এভাবেই ছড়িয়ে পড়লো শাহ আমানতের নাম। তিনি জনগণের মাঝে ব্যাপকভাবে ইসলামের দাওয়াত দিতে লাগলেন। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে লোকজন তাকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করতে লাগলো। তিনি আদালতের চাকরি ছেড়ে দিয়ে নিজ আস্তানা গড়ে তুললেন। সেখান থেকে তিনি ইসলামের মহান বাণী চারিদিকে ছড়িয়ে দিতে লাগলেন। তিনি মুজাদ্দেদীয়া ও নকশবন্দিয়া তরিকার

পীর ছিলেন। অধ্যক্ষ শইখ শরফুদ্দীন বলেন, "তিনি ঢাকার হযরত মাওলানা শাহ আবদুর রহীম শহীদের নিকট মুজাদ্দেদীয়া তরীকায় শিক্ষালাভ করেন ও পরে তার খলিফা হন। তিনি নকশবন্দিয়া তরিকারও শিক্ষালাভ করেন এবং মুরিদগণকে এ বিষয়ে শিক্ষা দান করেন। ঢাকার খ্যাতনামা মাওলানা সুফী দায়েম তার মুরিদ ছিলেন।"[৯] তিনি অষ্টাদশ শতাব্দির শেষ ভাগ থেকে উনবিংশ শতাব্দির প্রথম ভাগ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন বলে ধারণা করা হয়। চট্টগ্রামে ইসলাম ধর্ম প্রচার ও প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তার অবদানকে কোনভাবেই অস্বীকার করা যায় না।

তথ্য নির্দেশ ঃ

১. তার পরিচয় সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কেউ কেউ বলেন যে, তিনি ছিলেন হযরত আবদুল কাদির জিলানী (রহঃ) এর বংশধর। আবার কেউ কেউ ভিন্ন মত পোষণ করেন। ডঃ গোলাম সাকলায়েন বলেন, "শাহ আমানত হযরত আবদুল কাদির জিলানীর বংশধর ছিলেন।" বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন "বাংলাদেশের সুফী সাধক" ডঃ গোলাম সাকলায়েন ঢাকা-২০০৩, পৃ. ১৪২। কিন্তু মাওলানা এম, ওবায়দুল হক বলেন, "হযরত শাহ আমানত (রহঃ) পাঠান বংশে জন্মগ্রহণ করেন।" বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন "বাংলাদেশের পীর আওলিয়াগণ" প্রথম খণ্ড ঢাকা-১৯৮১। মাওলানা ওবায়দুল হকের সাথে প্রায় একই মত পোষণ করে মাওলানা নুরুর রহমান বলেন, "তিনি পাকিস্তানের সীমান্ত প্রদেশের লোক ছিলেন।" বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন "তাযকেরাতুল আওলিয়া" মাওলানা নুরুর রহমান ঢাকা-১৯৯৯।

২. কেউ কেউ তার চট্টগ্রামে আগমন কাল সপ্তদশ শতাব্দির শেষের দিকে ১৭৯৩ খ্রিষ্টাব্দের কোন এক সময়ে হয়েছিল বলে মন্তব্য করেন। বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন "বাংলাদেশের সুফী সাধক ও অলী আওলিয়া" সাদেক শিবলী জামান ঢাকা-২০০১। "তাযকেরাতুল আওলিয়া" রশীদ আহমদ ঢাকা-২০০৩।

৩. বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন তাযকেরাতুল আওলিয়া" রশীদ আহমদ পূর্বক্ত।

৪. ডঃ গোলাম সাকলায়েন "বাংলাদেশের সুফী সাধক" পূর্বক্ত পৃ-১৪২।

৫. রশীদ আহমদ বলেন যে, উকিল পত্র মারফৎ তাকে সে খবর জানান। লোকটি মনে করে সম্ভবত কেউ সেই পত্র গোপন করেছে। বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন "তাযকেরাতুল আওলিয়া" রশীদ আহমদ প্রাগুক্ত ঢাকা-২০০৩।

৬. বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন "বাংলাদেশের পীর আওলিয়াগণ প্রথম খণ্ড" মাওলানা ওবায়দুল হক পূর্বক্ত ঢাকা-১৯৮১।

৭. সাদেক শিবলী জামান বলেন যে, লোকটির সম্পত্তি উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত। বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন "বাংলাদেশের সুফী সাধক ও অলী আওলিয়া" পূর্বক্ত ঢাকা-২০০১।

৮. সাদেক শিবলী জামান চাদরের কথা উল্লেখ করেছেন। বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন ঐ পৃ. ৩০।

৯. "বাংলাদেশে সুফী প্রভাব ও ইসলাম প্রচার" অধ্যক্ষ শাইখ শরফুদ্দীন ঢাকা-২০০৬ পৃ. ৩৮-৩৯।

হযরত শাহজালাল (রহঃ)

বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের ইতিহাস হযরত শাহ জালালের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। মূলতঃ তার হাত ধরেই সিলেটে ইসলামের ব্যাপক প্রচার ও প্রসার ঘটে। তিনি তার সু-মহান চরিত্র ও মাহাত্ম দ্বারা সিলেটে এক নব জীবনের সূচনা করেন।

তিনি ৫৯৫ হিজরীতে ১১৯৭ খ্রিস্টাব্দে[১] তুরস্কের কুর্ণিয়া শহরে[২] এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম ছিল মোহাম্মদ[৩]। তার পিতা ছিলেন মক্কার সম্ভ্রান্ত কুরাইশ বংশের। তার মাতা ছিলেন সৈয়দ বংশের। তিনি অতি শৈশবেই পিতৃমাতৃহীন হন। তার মামা সৈয়দ আহমদ কবীর সহরাওয়াদী[৪] তাকে নিজের কাছে নিয়ে আসেন। ৩১ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি মামার কাছেই ছিলেন। আধ্যাত্মিক শিক্ষায় তিনি যখন চরম উৎকর্ষ লাভ করেন তখন তার মামা তাকে এক মুঠো মাটি দিয়ে বলেন যে, যেখানে এ মাটির রং ও গন্ধ মিশে যাবে সেখানেই তাকে তার আস্তানা গড়তে। তার মামা তার সাথে ১২ জন শিষ্যসহ মতান্তরে ৭০০ জন শিষ্যসহ তার সাথে প্রেরণ করেন। তারা বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করে শেষে ইয়েমেনে এসে উপস্থিত হন। ইয়েমেনে এসে তারা ইসলাম ধর্ম প্রচার করতে থাকেন। কিন্তু ইয়েমেনের রাজা হযরত শাহজালাল খাটি পীর কিনা

তা পরীক্ষা করবার জন্য এক গ্লাস সরবতে বীষ মিশিয়ে তার কাছে পাঠিয়ে দেন। বীষ মিশানো পানি খেয়ে দরবেশের কিছুই হলোনা। উল্টো রাজা বীষক্রিয়ায় মৃত্যুবরণ করেন। তা দেখে রাজার ছেলে শাহজাদা আলী তার সাথে তাকে নিয়ে নেয়ার জন্য অনুরোধ করেন। এভাবে ইয়েমেন থেকে চলে এসে তিনি বিভিন্ন যায়গায় ভ্রমণ করে শেষে বাগদাদে এসে উপস্থিত হন। ১২৫৮ খ্রিস্টাব্দে মোঙ্গল বীর বর্বর হালাকু খান বাগদাদ আক্রমণ করে ধ্বংসের উন্মাদনায় মেতে ওঠেন। বাগদাদের ২০ লক্ষ লোকের মধ্যে ১৬ লক্ষ লোককে হত্যা করা হয়। হালাকুর এই বর্বর আক্রমণের ফলে ৫০৮ বছর ব্যাপী আব্বাসীয় খিলাফতের গৌরবময় যুগের অবসান ঘটে। এ সময়ে হযরত শাহজালাল মোঙ্গলদের অত্যাচারের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য আবার পরিভ্রমণে বের হন। এরপর তিনি ভারতের রাজধানী দিল্লীতে এসে উপস্থিত হন। দিল্লীতে তখন বাস করতে উপমহাদেশের প্রখ্যাত দরবেশ হযরত নিযাম-উদ-দীন আওলিয়া (১২৩৬-১৩২৫ খ্রিঃ)। দিল্লীতে এসে হযরত শাহজালাল (রহঃ) জনগণের মাঝে ইসলামের মহানবাণী প্রচার করতে থাকেন। হযরত নিযাম-উদ-দীন আওলিয়ার কাছে হযরত শাহজালালের খবর আসলে তিনি তাকে পরীক্ষা করতে চাইলেন যে, তিনি আসলেই খাটি ওলী কিনা? নিযাম-উদ-দীন আওলিয়ার পরীক্ষায় হযরত শাহজালাল উত্তীর্ণ হলেন। হযরত নিযাম-উদ-দীন আওলিয়া তাকে তার কাছে থাকবার জন্য আমন্ত্রণ জানান। এতে সাড়া দিয়ে হযরত শাহজালাল নিযাম-উদ-দীন আওলিয়ার আস্তানায় আসেন। সেখানে কিছুদিন অবস্থান করেন। শেষে তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাংলার পথে অগ্রসর হন[৫]। দিল্লী থেকে ফিরে আসার আগে হযরত নিযাম-উদ-দীন আওলিয়া তাকে কতগুলো জালালী কবুতর উপহার দেন[৬]। যখন তিনি বাংলায় আসেন তখন বাংলার সুলতান ছিলেন শামস-উদ-দীন ফিরোজ শাহ
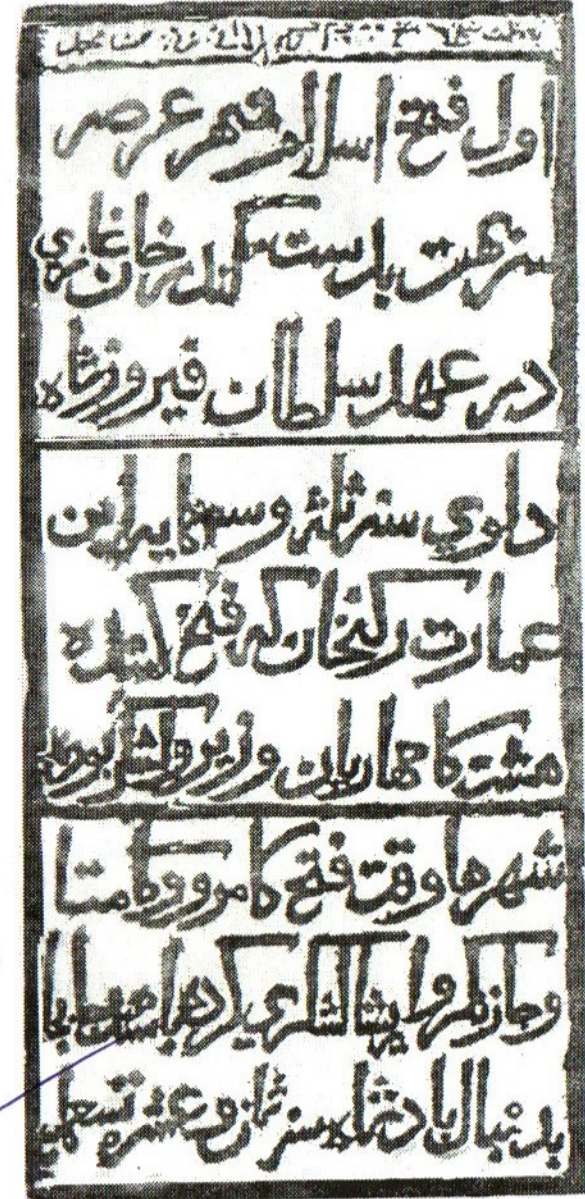
৯১৮ হিজরী/১৫১২ খ্রিষ্টাব্দে সুলতান হোসেন শাহী শিলালিপি। এতে হযরত শাহজালাল (রহঃ)-এর পরিচয় ও সিলেট বিজয়ের তারিখ দেয়া আছে।

হযরত শাহজালাল (র)-এর মাযার।
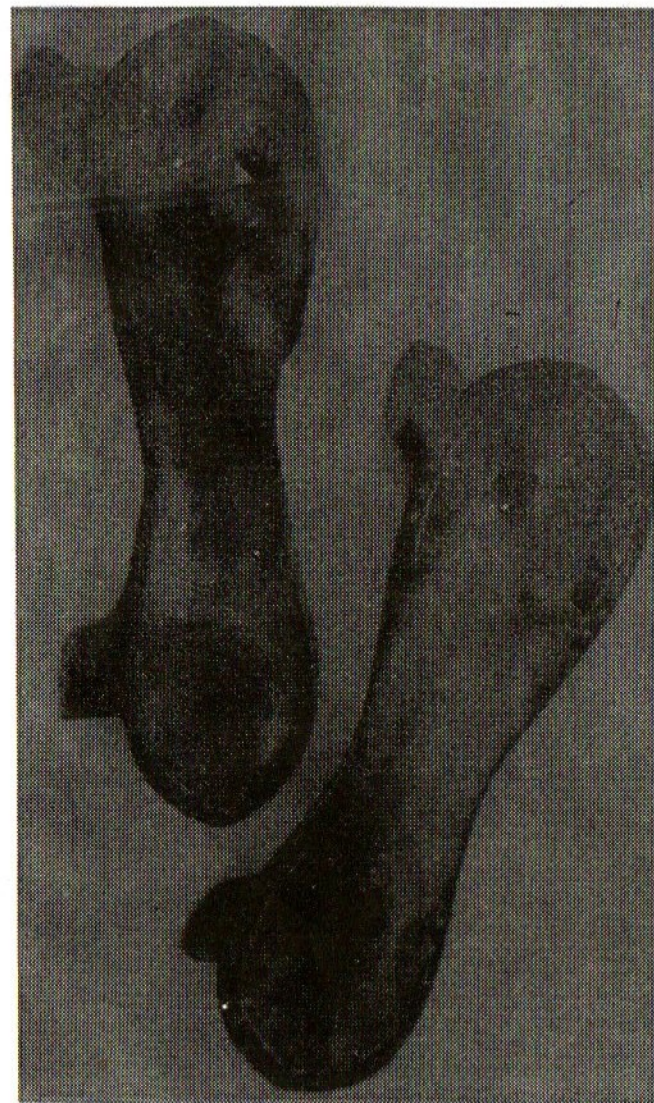
হযরত শাহ্ জালাল (রঃ) এঁর ব্যবহৃত কাঠের খরম
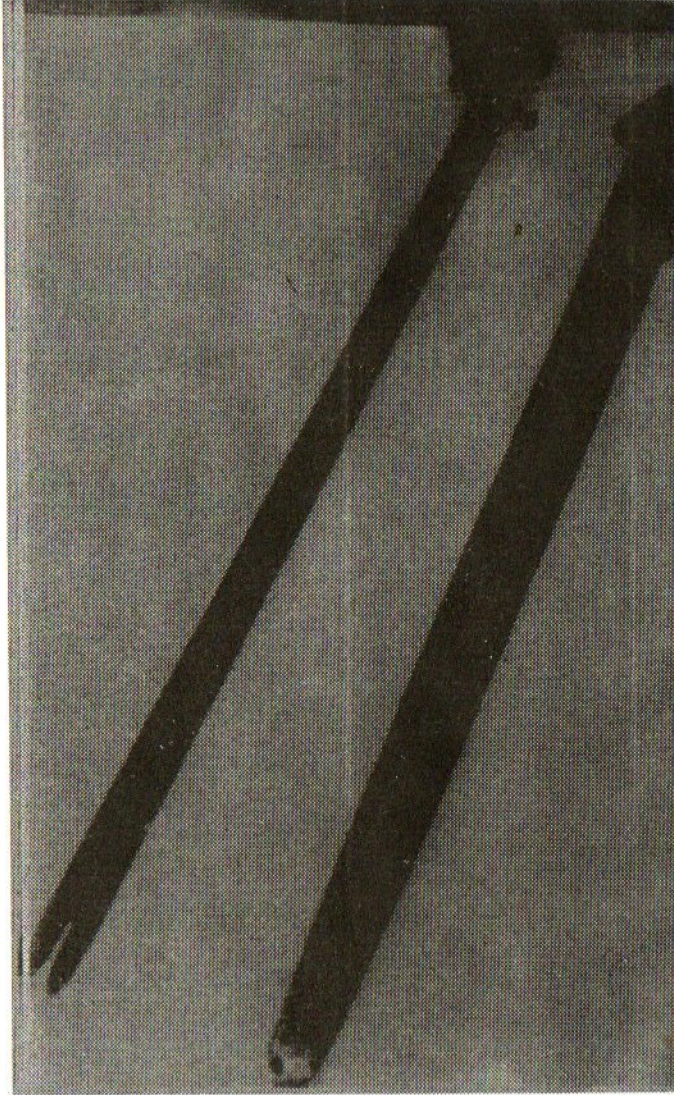
হযরত শাহ্ জালাল (রঃ) এঁর ব্যবহৃত তলোয়ার ও খাপ

(১৩০০–১৩২২ খ্রিঃ)। এ সময়টা তখন ছিল বাংলায় মুসলিম শাসন দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা পাবার স্বর্নযুগ। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল তখন মুসলমানদের দখলে আসতে থাকে একের পর এক। এরই ফলশ্রুতিতে সিলেটের দিকে সুলতান শামস-উদ-দীন ফিরোজ শাহ অভিযান প্রেরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ঠিক সেই সময় হযরত শাহজালাল সিলেটের কাছাকাছি এসে পৌঁছেন। মুসলমানদের সিলেট বিজয়ের পিছনে রয়েছে এক কিংবদন্তী[৭]। এই কিংবদন্তী মতে, সিলেটে তখন বুরহান-উদ-দীন নামে একজন মুসলমান বাস করত। তার কোন পুত্র সন্তান না থাকায় তিনি আল্লাহ্‌র কাছে মানত করেন যে, যদি আল্লাহ্ তার ঘরে একটি পুত্র সন্তান জন্মদেন তাহলে তিনি একটি গরু কুরবানী দিবেন। যথাসময়ে তার ঘরে একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে এবং তার মানত মত তিনি একটি গরু কুরবানী দেন। কিন্তু এক চিল এসে এক টুকরো গরুর মাংশ নিয়ে যাবার সময় তার থাবা থেকে সে মাংশ গিয়ে পড়ে রাজা গৌড় গোবিন্দের মন্দিরের প্রধান পুরোহিতের সামনে। এই গরুর মাংশের টুকরা দেখে পুরোহিত তা রাজার কাছে নিয়ে যায় এবং তা দেখে রাজা প্রচণ্ড ক্ষেপে যায় এবং বুরহান-উদ-দীনকে চরম শাস্তি দেন। তার নবজাতক পুত্রকে তার সামনে হত্যা করা হয় এবং তার ডান হাতে কেটে ফেলা হয়[৮]। তিনি এর প্রতিশোধ নেবার জন্য বাংলার সুলতান শামস-উদ-দীন ইলিয়াস শাহের কাছে যান[৯]। বাংলার সুলতান গৌড় গোবিন্দের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করে সাফল্য লাভ করতে পারেননি। এরপর বুরহান-উদ-দীন দিল্লীর সুলতান ফিরোজশাহ তুঘলকের (১৩৫১–৮৮ খ্রিঃ) কাছে যান[১০]। তিনি তার ভাগিনা[১১] সিকান্দার গাজিকে এক বিশাল বাহিনীসহ সিলেট বিজয়ে প্রেরণ করেন। প্রাথমিক অভিযান ব্যর্থ হলে পরে সুলতান নাসির-উদ-দীনকে সিপাহসালার নিযুক্ত করে সিকান্দার গাযীর সাহায্যার্থে প্রেরণ করেন। এই দলের সাথে ৩৬০

জন আওলিয়া সঙ্গে নিয়ে হযরত শাহজালাল যোগদান করেন। শেষে হযরত শাহজালালের আধ্যাত্মিক শক্তির প্রভাব সিলেট মুসলমানদের দখলে আসে। এটি হল আসলে নিছক একটি কিংবদন্তী। এর কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, যখন হযরত শাহজালাল বাংলায় আসেন তখন বাংলার সুলতান ছিলেন শামস-উদ-দীন ফিরোজ শাহ। এই শামস-উদ-দীন ফিরোজ শাহের আমলেই ১৩০৩ খ্রিস্টাব্দে সিকান্দার গাযীর নেতৃত্বে সর্বপ্রথম সিলেট বিজয় সম্পন্ন হয়। হযরত শাহজালাল এই অভিযানে অংশগ্রহণ করেন[১২]। মূলতঃ তারই হাত ধরে সিলেটে ব্যাপকভাবে ইসলামের প্রসার ঘটে। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে তিনি সকলের কাছে প্রিয় ছিলেন। তিনি ছিলেন এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। তার এই প্রভাব যে শুধু সিলেটেই ছড়িয়ে পড়ে তাই নয় বরং সমগ্র বিশ্বে তার নাম ছড়িয়ে পড়ে। আফ্রিকার বিখ্যাত পর্যটক ইবনে বতুতা ১৩৪৫-৪৬ খ্রিস্টাব্দে তার সাথে দেখা করবার জন্য চট্টগ্রাম হয়ে সিলেটে আসেন। তিনি এখানে এসে তার আতিথ্য গ্রহণ করেন। তিনি শেখের অনেক অলৌকিক শক্তির বর্ণনা দেন এবং তার সম্পর্কে একটা মোটামুটি বিবরণ রেখে যান[১৩]। তিনি বলেন যে শেখ ১৫০ বছর বয়সে ৭৪৮ হিজরীতে ১৩৪৭ খ্রিস্টাব্দে ইন্তেকাল করেন[১৪]। সিলেটে ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তার অবদানকে কোন ভাবেই অস্বীকার করা যায় না।

তথ্য নির্দেশ ঃ

১. হযরত শাহজালাল (রহঃ) এর জন্ম তারিখ নিয়ে বিতর্ক আছে। আমরা সমসাময়িক পরিব্রাজক ইবনে বতুতার বিবরণকে অধিক গুরুত্ব দিয়েছি। ইবনে বতুতা ১৩৪৫-৪৬ খ্রিস্টব্দে কামরূপে (সিলেট) যখন তার সাথে দেখা করেন তখন তার বয়স ছিল ১৪৯ বছর। অতএব, তিনি ৫৯৫ হিজরী ১১৯৭ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।

২. হযরত শাহজালাল সম্পর্কিত বেশিরভাগ জীবনী গ্রন্থে তাকে ইয়েমেনের অধিবাসী বলে দেখানো হয়েছে। কিন্তু ১৬১৩ খ্রিষ্টাব্দে লিখিত "গুলজার আবরার" নামক ফার্সী গ্রন্থে দেখা যায় যে, তিনি ছিলেন তুর্কীস্থানী জাত বাঙ্গালী। এছাড়া তার দরগায়ে প্রাপ্ত শিলালিপি দ্বারাও প্রমাণ পাওয়া যায় যে, তিনি তুরস্কের অধিবাসী ছিলেন।

৩. বাংলার হোসেন শাহী বংশের প্রতিষ্ঠাতা সুলতান আলা-উদ-দীন হোসেন শাহের আমলে (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রিঃ) উৎকীর্ণ একখানি শিলালিপি থেকে আমরা হযরত শাহজালালের পিতার নাম মোহাম্মদ জানতে পারি।

৪. ডঃ গোলাম সাকলায়েন সৈয়দ আহমদ কবীর সাহরাওয়ার্দীকে হযরত শাহজালাল (রহঃ) এর খালু বলেছেন। বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন "বাংলাদেশের সুফী সাধক" ঢাকা-২০০৩। "তাযকেরাতুল আওলিয়ার" লেখক মাওলানা নুরুর রহমানও অনুরূপ মন্তব্য করেছেন। বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন "তাযকেরাতুল আওলিয়া" ঢাকা-২০০১।

৫. এ সম্পর্কে আমবা বিস্তারিত আলোচনা করেছি অন্যত্র দেখুন "বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য" মাহবুবুর রহমান, ঢাকা-২০০৫।

৬. বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন "বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য" প্রাগুক্ত।

৮. ঐ পূর্বক্ত।

৯. "মুজাহিদে ইসলাম হযরত শাহজালাল (রহঃ)" মাওলানা মাজহার উদ্দিন আহমেদ ঢাকা-১৯৯৭ পৃ. ২৯। "হযরত শাহজালাল (রহঃ)" শাহওয়ালীউল্লাহ ঢাকা-২০০১ পৃ. ৪২। "হযরত শাহজালাল" সম্পাদনা মুহাম্মদ নুরউল্লাহ আযাদ ঢাকা-২০০১ পৃ. ১৩৬। "বাংলাদেশের সুফী সাধক ও অলী আওলিয়া" সাদেক শিবলী জামান ঢাকা-২০০১ পৃ. ৬৩।

১০. "হযরত শাহজালাল" পূর্বক্ত পৃ. ৪৬। "মুজাহিদে ইসলাম হযরত শাহজালাল (রহঃ)" পূর্বক্ত পৃ. ৩২।

১১. "সুহেল-ই-ইয়ামেনের" লেখক নাসির-উদ-দীন হায়দারের মতে, ভাতিজা। বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন "সুহেল-ই-ইয়ামেন" নাসির-উদ-দীন হায়দার ঢাকা-২০০৩।

১২. বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন "বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য" প্রাগুক্ত ঢাকা-২০০৫।

১৩. ইবনে বতুতার বিবরণের জন্য দেখুন "ইবনে বতুতার সফরনামা (অনু. নাসির আলী)" ঢাকা-২০০২।

১৪. হযরত শাহজালালের মৃত্যুর তারিখ নিয়ে বিতর্ক আছে। তবে আমরা ইবনে বতুতার মতকে গ্রহণ করেছি।

গ্রন্থপুঞ্জী

বাংলা গ্রন্থাবলী (মৌলিক)

১. "বাংলার ইতিহাস (সুলতানী আমল)" ডঃ আবদুল করিম, ঢাকা-১৯৯৯।

২. "মুদ্রায় ও শিলালিপিতে মধ্যযুগের বাংলার সমাজ-সংস্কৃতি" ডঃ এ. কে. এম. শাহনাওয়াজ ঢাকা-১৯৯৯।

৩. "মুসলিম কীর্তি" ডঃ এম. আবদুল কাদের ঢাকা-১৯৮৮।

৪. "গৌড়ে মুসলিম শাসন ও নূর কুতুব উল আলম" অধ্যাপক মুহাম্মদ সগীর উদ্দিন মিঞা ঢাকা ১৯৯১।

৫. "বাংলাদেশের ইতিহাস (মধ্যযুগ)" ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত কলিকাতা-১৯৯৮।

৬. "বাঙ্গালার ইতিহাস" রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতা প্রথম খণ্ড ১৯৯৫ দ্বিতীয় খণ্ড ১৯৯৬।

৭. "বাংলা সাহিত্যের কালক্রম" ডঃ আবদুল করিম ঢাকা-১৯৯৪।

৮. "১২০৪-১৫৭৬ বাংলার ইতিহাস" সুখময় মুখোপাধ্যায় ঢাকা-২০০০।

৯. "বাংলার ইতিহাস (মুসলিম বিজয় থেকে সিপাহী বিপ্লব পর্যন্ত ১২০০-১৮৫৭ খ্রিঃ)" ডঃ আবদুল করিম ঢাকা-১৯৯৯।

১০. "বাংলার ইতিহাস ও ঐহিত্য" মাহবুবুর রহমান, ঢাকা-২০০৫।

১১. "হযরত শাহজালাল কুনিয়াভি (রহঃ)" এ. জেড. এম. শামসুল আলম, ঢাকা-২০০১।

১২. "বাংলাদেশের ইতিহাস" ডঃ আবদুল মোমিন চৌধুরী, ডঃ সিরাজুল ইসলাম ও অন্যান্য, ঢাকা-১৯৯৭।

১৩. "বাংলাদেশে ইসলাম" আবদুল মান্নান তালিব, ঢাকা-১৯৯৩।

১৪. "বাংলাদেশের সুফী সাধক" ডঃ গোলাম সাকলায়েন, ঢাকা-২০০৩।

১৫. "সুফীবাদ ও আমাদের সমাজ" ডঃ কাজী দিন মোহাম্মদ সম্পাদিত, ঢাকা-১৯৬৯।

১৬. "বাংলাদেশে সুফী প্রভাব ও ইসলাম প্রচার" অধ্যক্ষ শাইখ শরফুদ্দীন, ঢাকা-২০০৬।

১৭. "ইসলাম জগৎ ও সুফী সমাজ" ডঃ ওসমান গনী কোলকাতা-২০০২।

১৮. "কিংবদন্তির ঢাকা" নাজির হোসেন ঢাকা-১৯৯৫।

১৯. "ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলিম শাসন" ডঃ আবদুল করিম, ঢাকা-১৯৯৭।

২০. "ভারতে মুসলিম রাজত্বের ইতিহাস" প্রফেসর এ. কে. এম. আবদুল আলিম, ঢাকা-১৯৯৬।

২১. "বাংলাদেশের উৎপত্তি ও বিকাশ" ডঃ কাজী দীন মোহাম্মদ, ডঃ কে. এম. মহসীন ও অন্যান্য প্রথম খণ্ড, ঢাকা-১৯৯৩।

২২. "চট্টগ্রামে ইসলাম" ডঃ আবদুল করিম, ঢাকা-১৯৭০।

২৩. "হযরত শাহজালাল (রহঃ)" মুহাম্মদ নূর উল্লাহ আযাদ সম্পাদিত, ঢাকা-২০০১।

২৪. "হযরত শাহজালাল" দেওয়ান নুরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, ঢাকা-১৯৯৯।

২৫. "বাংলাদেশের সুফী সাধক ও অলী আওলিয়া" সাদেক শিবলী জামান, ঢাকা-২০০১।

২৬. "বাংলাদেশের পীর আওলিয়াগণ প্রথম খণ্ড" মাওলানা ওবায়দুল হক, ঢাকা-১৯৮১।

২৭. "পাকিস্তানের সুফী সাধক" আ. ন. ম. বজলুর রশীদ, ঢাকা-১৯৬৯।

২৮. "পাক-ভারতের আওলিয়া ২য় খণ্ড" আবদুল জলীল, ঢাকা-১৯৬৮।

২৯. "দরগাহ দরবেশ" মনওয়ার হোসেন ঢাকা-১৯৮০।

৩০. "মুসলিম সংস্কারক ও সাধক" হুমায়ুন আবদুল হাই, ঢাকা-১৯৭৬।

৩১. "হযরত শাহজালাল (রহঃ)" শাহ ওয়ালীউল্লাহ, ঢাকা-২০০১।

৩২. "মুজাহিদে ইসলাম হযরত শাহজালাল (রহঃ)" মাওলানা মাজহার উদ্দিন আহমেদ, ঢাকা-১৯৯৭।

৩৩. "হযরত শাহ পরান (রহঃ)" মাওলানা মাজাহার উদ্দিন আহমেদ, ঢাকা-১৯৯৪।

৩৪. "সুফী সাধনার ভূমিকা" ডঃ রশীদুল আলম, ঢাকা-২০০২।

৩৫. "মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস" মাওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁ, ঢাকা-২০০২।

৩৬. "গৌড়ের ইতিহাস" রজনীকান্ত চক্রবর্তী কলকাতা-১৯৯৯।

৩৭. "শ্রীহট্টে ইসলাম জ্যোতি" মুফতি আজহার উদ্দিন আহমদ সিদ্দিকী, ঢাকা-২০০২।

৩৮. "হযরত শাহজালাল ও সিলেটের ইতিহাস" সৈয়দ মুর্তজা আলী, ঢাকা-২০০৩।

৩৯. "উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলিমদের রাজনৈতিক জীবন" মাওঃ আবু বকর সিদ্দীক, ঢাকা-২০০৪।

৪০. "বাংলাদেশে সুফী দর্শনের রূপরেখা" অধ্যাপিকা লাভলী আখতার ডলী, ঢাকা-২০০১।

৪১. "শিক্ষা বিস্তার ও সংস্কারে ফুরফুরার পীর আবু বকর সিদ্দীকী (রহঃ)" ডঃ আ. র. ম. আলী হায়দার, ঢাকা-২০০৪।

৪২. "খানে আজম হযরত খান জাহান আলী (রহঃ)" সৈয়দ ওমর ফারুক হোসেন, খুলনা-১৯৮২।

৪৩. "হযরত কেবলা" এ. এফ. এম. আবদুল মজীদ রুশদী, ঢাকা-১৯৯৭।

৪৪. "হযরত মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (রহঃ)" মীর রেজাউর রহমান, ঢাকা-২০০১।

৪৫. "যশোর জেলায় ইসলাম" অধ্যাপক মুহাম্মদ আবু তালিব, ঢাকা-১৯৯১।

৪৬. "বরিশালে ইসলাম" আজিজুল হক বান্না, ঢাকা-১৯৯৪।

৪৭. "রংপুরে ইসলাম" মোহাম্মদ হাসান আলী চৌধুরী, ঢাকা-১৯৯৪।

৪৮. "পাবনায় ইসলাম" অধ্যাপক মুহাম্মদ আবু তালিব, ঢাকা-১৯৯৬।

৪৯. "যশোর জেলায় ইসলাম প্রচার ও প্রসার" নাসির হেলাল, ঢাখা-১৯৯২।

৫০. "হযরত শাহজালাল (রহঃ) ও তার কারামত" সৈয়দ মোস্তফা কামাল, সিলেট-২০০৩।

৫১. "পাবনার ঐতিহাসিক ইমারত" ডঃ আয়শা বেগম, ঢাকা-২০০২।

৫২. "বাংলাদেশের মুসলিম পুরাকীর্তি" ডঃ সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, ঢাকা-২০০১।

৫৩. "আমাদের ঐতিহ্য শাহজাদপুর মসজিদ" ডঃ আয়শা বেগম, ঢাকা-১৯৯০।

৫৪. "মাওলানা আবদুল আউয়াল জৈনপুরী" ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, ঢাকা-১৯৯৫।

৫৫. "তাযকেরাতুল আওলিয়া" রশীদ আহমদ ঢাকা-২০০৩।

৫৬. "তাযকেরাতুল আওলিয়া ৬ষ্ঠ খণ্ড" মাওলানা নুরুর রহমান, ঢাকা-১৯৯৯।

৫৭. "ইসলাম প্রসঙ্গ" ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ঢাকা-

৫৮. "সুফী দর্শন" চৌধুরী শামসুর রহমান, ঢাকা-২০০২।

৫৯. "হযরত খন জাহান আলী (রহঃ)" আবুল ফাতাহ, মাওলানা জয়নুল আবেদীন খুলনা-১৯৯১।

৬০. "কুষ্টিয়া জেলায় ইসলাম" শ. ম. শওকত আলী, ঢাকা-১৯৯২।

৬১. "ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ)" ডঃ মুহাম্মদ রাইছ উদ্দিন ভূঞা, ঢাকা-২০০৫।

বাংলায় অনুদিত ফার্সী, উর্দু, আরবী ও ইংরেজি গ্রন্থাবলী

১. "সুহেল-ই-ইয়ামেন" মৌলভী নাসির উদ্দিন হায়দার (অনু. মোস্তাক আহমদ দীন) ঢাকা-২০০৩।

২. "ইবনে বতুতার সফরনামা" মোহাম্মদ নাসীর আলী অনুদিত ঢাকা-২০০২।

৩. "বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস" ডঃ এম. এ. রহিম, (অনু. মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান) ঢাকা- প্রথম খণ্ড ১৯৯৫ (দ্বিতীয় খণ্ড-১৯৯৬।

৪. "আসুদেগানে ঢাকা" হাকিম হাবিবুর রহমান (অনু. মাওলানা আকরাম ফারুক ও আলহাজ্জ মাওলানা আ. ন. ম. রুহুল আমিন চৌধুরী, ঢাকা-১৯৯০।

৫. "ঢাকা পঞ্চাশ বছর আগে" হাকিম হাবিবুর রহমান (অনু. মো. রেজাউল করিম) ঢাকা-১৯৯৫।

৬. "বাংলার প্রাথমিক যুগের স্বাধীন সুলতানদের মুদ্রা ও কালক্রম" নালিনীকান্ত ভট্টশালী (অনু. মো. রেজাউল করিম) ঢাকা- ১৯৯৭।

৭. "পূর্ব বঙ্গের বিভিন্ন জাতি, বর্ণ ও পেশার বিবরণ" জেমস ওয়াইজ (অনু. ফওজুল করিম) ঢাকা প্রথম খণ্ড-২০০০ দ্বিতীয় খণ্ড-২০০০।

৮. "বাংলার মুসলমানদের সামাজিক ইতিহাস (১৫৩৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত)" ডঃ আবদুল করিম (অনু. মোকাদ্দেসুর রহমান) ঢাকা-২০০৬।

৯. "ইসরারুল আওলিয়া (আওলিয়া রহস্য)" মাওলানা বদরুদ্দীন ইসহাক (অনু. মাওলানা আবদুল জলীল) ঢাকা-২০০৩।

১০. "বিলায়েতনামা" মির্জা শেখ ইতিমাসুদ্দীন (অনু. আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ) ঢাকা-১৯৮১।

ইংরেজি গ্রন্থাবলী (মৌলিক)

1. "Dhaka The Mughal Capital" Dr. Abdul Karim Dhaka-1996.

2. "Dhaka Tale of a City" Dr. Muntassir Mamoon Dhaka-1991.

3. "Gaud And Hazrat Pandua" Dr. Syed Mahmudul Hassan Dhaka-1987.

4. "The Adina Musjid At Hazrat Pandua" Dr. S.M. Massan Dhaka-1980.

5. "Some Aspects of the Principal Sufi Orders in India" Muhammad Muzammil Huq. Ehaka-1985.7